# চা বাগিচার সংগীত ও জীবন

## সুখবিলাস বর্মা

চা-বাগান ও চা-শিল্পের ইতিহাস পর্যালোচনা থেকে জানা যায় যে ভারতবর্ষে এই কাজ প্রথম শুরু হয় ১৮৩৫ সালে আসামের লখিমপুর অঞ্চলে। ১৮৩৬ সালে সেখান থেকে প্রথম চা রপ্তানি হয় ইংলন্ডে। ১৮৩৯ সালে বেশ কয়েকটি ছোট ছোট ব্রিটিশ কোম্পানির সহযোগে গঠিত হয় Assam Tea Company Limited.

ধীরে ধীরে চা উৎপাদনের তারা বিস্তৃতি কাজ লাভ করে পশ্চিমবঙ্গের পার্বত্য এলাকা ও তরাই অঞ্চলে । পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং-এ প্রথম চা উৎপন্ন করেন Dr. Campbell ১৮৪৫ সালে। কার্শিয়াং ও দার্জিলিং-এ চা-বাগানের কাজ মোটামুটিভাবে শুরু হয়ে যায় ১৮৫৬ সালে। পার্বত্য অঞ্চল থেকে ক্রমেই চা-বাগান বিস্তারলাভ করে তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলের পতিত ভূমির বিস্তৃত অঞ্চল নিয়ে। জলপাইগুড়ি জেলায় চা-শিল্পের কাজ ব্যবসায়িক ভিত্তিতে শুরু হয়ে যায় ১৮৭৪-৭৫ সালের দিকে।

পশ্চিমবঙ্গের তরাই, ডুয়ার্স অঞ্চল ও আসামের যে অঞ্চলে চা-বাগান প্রথম শুরু হয়, সে-সব অঞ্চল ছিল লোকবসতি বিরল। অঞ্চলের বাসিন্দারা প্রধানত কৃষিজীবী ছিলেন—যদিও কৃষি ছিল খুবই অনুন্নত। প্রায় সকল পরিবারই সামান্য হলেও কিছু পরিমাণ জমির মালিক ছিলেন। স্বভাবতই এই অঞ্চল থেকে চা-বাগানে কাজ করার মতো শ্রমিকের অভাব ছিল। ফলে চা-বাগানের মালিক বিদেশি কোম্পানিকে অন্য কোথাও থেকে সস্তায় অর্থাৎ কম পারিশ্রমিকের শ্রমিক জোগাড় করতে হয়েছিল। এই শ্রমিক তারা জোগাড় করেছিলেন বিহারের ছোটনাগপুর অঞ্চল, মালভূমি অঞ্চল ও তৎপার্শ্ববর্তী পশ্চিমবঙ্গের ও ওড়িশার জেলাগুলি থেকে প্রধানত ভূমিহীন খেতমজুর আদিবাসী ও তথাকথিত নিম্নজাতের শ্রমিকদের মধ্য থেকে। তাই তরাই, ডুয়ার্স, অসমের চা-বাগানে কর্মরত শ্রমিকদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়—ওঁরাও, খড়িয়া, অসুর, বারিক, নায়েক, গোন্ড, সাঁওতাল প্রভৃতি আদিবাসী গোষ্ঠীর শ্রমিক এবং কুম্হার, তাঁতি, শাহ প্রভৃতি গোষ্ঠীর শ্রমিক। অবশ্য এদের সঙ্গে রয়েছে পাহাড়ি এলাকা থেকে আগত কিছুসংখ্যক লেপ্চা, নেপালি, ভুটিয়া গোষ্ঠীর শ্রমিক এবং স্থানীয় বড় জনগোষ্ঠীর শ্রমিক। এখানে লক্ষ করার বিষয় যে, পাহাড়ের উপরের চা-বাগানগুলিতে বিহার ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে আগত শ্রমিকের সংখ্যা অতি নগণ্য, তার কারণ সেখানকার জলবায়ু।

বিহার ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে শ্রমিকগণ উত্তরবঙ্গের তরাই, ডুয়ার্স ও আসামের চা বাগানগুলিতে এসেছিলেন বিশেষ পরিস্থিতিতে। ভিন্ন পরিবেশে এদের জীবনধারা, দৈনন্দিন জীবন, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ভাষা কিভাবে প্রভাবিত হয়েছে তা বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা যেতে পারে। আমরা চা-বাগিচার কিছু লোকসংগীত বিশ্লেষণের মাধ্যমে

তাদের জীবনে চা-বাগানের প্রভাবকে বুঝতে চেষ্টা করছি।

লোকসংগীতে কোনও নির্দিষ্ট আদিবাসী গোষ্ঠী বা নির্দিষ্ট লোকগোষ্ঠীর জীবনদর্শনের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। চা-বাগিচা এলাকার সংগীত বিশ্লেষণে আমরা সেই চেষ্টাই করছি।

এ প্রসঙ্গে ১৯৬২-১৯৬৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আদিবাসী কল্যাণ বিভাগের অধীন Cultural Research Institute কর্তৃক অনুসন্ধানমূলক গবেষণাকার্যের উল্লেখ করা যায়। জলপাইগুড়ি জেলার চা-বাগিচা শ্রমিকদের জীবনধারা নিয়ে এই অনুসন্ধান থেকে আমরা শ্রমিকদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে সবিশেষ ধারণা পাই। এই একই ধারণা লাভ করি আমরা ওই অঞ্চলের সংগীতের বিশ্লেষণ থেকেও। এখানে আমরা কয়েকটি সংগীতের উল্লেখ করছি। এই গানগুলি আমরা পেয়েছি প্রখ্যাত লোকসংগীতশিল্পী শ্রীকালী দাশগুপ্ত মহাশয়ের কাছ থেকে। শ্রীদাশগুপ্ত দীর্ঘদিন আসামের চা-বাগানে শ্রমিকদের মধ্যে কাটিয়ে গানগুলি সংগ্রহ করেছেন।

১৯৬৪ সালে প্রকাশিত Cultural Research Institute-এর উপরোক্ত বিশেষ Bulletin 'Impact of tea industry on the life of the tribes of West Bengal' থেকে আমরা যে বিবরণ পাই তা হল :

'...Since the middle of the 18th century i.e. at the initial stage of this industy, a huge number of natural labourers from different tribal belts of Bengal, Bihar and Orissa need to be collect every season by simply alluring them with the help of 'brokers'. Only those tribals who did not have secured economy, e.g. the landless labourers were tempted to participate in this sort of migration although not voluntarily and only very few of them could manage to come back. The rest of them were either forced or tempted to settle down in the tea garden areas thereby keeping the manpower secured for the industy. Some settled voluntarily being very much attracted by the care-free life far away from the binding of their traditional way of life and also by the security of service in the gardens.'

এই একই ধারণা পাই আমরা চা-বাগিচা অঞ্চলের বিভিন্ন গান থেকেও। বাগিচার মালিকের brokers অর্থাৎ আড়কাঠিরা শ্রমিকদের বিভিন্নভাবে প্রলুব্ধ করত। চা-বাগান অঞ্চলকে সেটা তরাই, ডুয়ার্স বা আসাম যাই হোক না কেন, তারা সোনার দেশ, স্বপ্নের দেশ, সৌভাগ্যের দেশ হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করত। যেমন একটা গানে পাই—

'আম ধরে ঝোপা ঝোপা
তেইতুল ধরে বেঁকা গ
পুরব দেশে গিয়াছিলাম্
রাঢ়ির হাতে শাঁখা গ।'

এখানে শাঁখা-গহনা অর্থে ব্যবহৃত।

অন্য একটি গানে পাই—

'চল মিনি আসাম যাব
দেশে বড় দুখ রে
আসাম দেশে রে মিনি
চা বাগান হরিয়ার।'

মিনি—অল্প বয়সের মেয়ে, বোন বা প্রেয়সী যাই হোক না কেন তাকে বোঝানো হচ্ছে নিজের দেশে কঠিন জীবন, কষ্টের জীবন তাদের। তাই তারা যাবেন সবুজের দেশ, ঐশ্বর্যের দেশ আসামে। আসাম বলতে শুধু আসাম নয়—উত্তরবঙ্গের তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলকেও বোঝানো হচ্ছে। বিহারের ছোটনাগপুর ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে দূরত্ব হেতু, ফারাক্কা বাঁধ তৈরি হওয়ার আগে এই সমস্ত অঞ্চল ছিল দুরতিগম্য এবং সমস্ত অঞ্চলই 'আসাম' হিসেবে গণ্য হত।

নিজের দেশে জমিদারদের অত্যাচার, নির্দয় প্রভৃতি থেকে রেহাই পাওয়ার আনন্দে এবং স্বপ্নের দেশ আসামে যাওয়ার আনন্দে তার মন পুলকিত। আরও বিশেষ আনন্দের বিষয় যে, তাকে যেতে হবে রেলগাড়িতে। জীবনে এই প্রথম বোধহয় সে রেলগাড়ি চেপে তার স্বপ্নের দেশে যাবে। তাই রেলগাড়ির কাব্যময় বর্ণনা।

'রেলগাড়ি কেইন সুন্দর
চলো দেইখে যাব
ভিতরে তো আইগ পানি
উপরে তো লোহালতি
হাওয়া কে সমান চলে
লাগে নধর শ্যাম।'

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই গানগুলির ভাষা সাধারণত 'সাদরি'। 'সাদরি' উপভাষাটি বাংলা হিন্দির অপভ্রংশ এবং আদিবাসী ভাষার সমন্বয়ে উদ্ভূত উপভাষা (dialect)। বিভিন্ন ভাষাভাষী ও সংস্কৃতির সমন্বয়সাধন ঘটেছে চা-বাগানে ব্যবহৃত কথ্যভাষায় এবং এখানকার সংস্কৃতিতে। Cultural assimilation-এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাই সংগীতের সুর, ভাষা ও বিষয়বস্তুতেও সেই সমন্বয়ের অপূর্ব নিদর্শন। গানের ভাষা 'সাদরি', সুর-ঝুমুর এবং বিষযবস্তু তাদের জীবনের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা, বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তাদের মনোভাবের সুন্দর প্রকাশ। গুরুত্বসহকারে লক্ষ করার বিষয় যে, যে-সব অঞ্চলে তারা এসেছেন সেখানকার ভাষা, সংগীত, সুর তাদের ভাষা, সংগীত ও সুরকে গ্রাস করে নেয়নি—নিতে পারেনি। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী, নেপালি, মেচ, রাভা ভাষার সঙ্গে তারা মোটামুটিভাবে পরিচিত, ভাওয়াইয়া গানের সঙ্গেও তাদের পরিচিতি রয়েছে, তেমনই আসামে অসমিয়া ভাষা ও কিছু সুরের সঙ্গে পরিচিতি রাখছে কিন্তু তাদের নিজস্ব সত্তা তারা ত্যাগ করেনি এবং এই আপন সত্তা রক্ষার তাগিদেই সৃষ্টি হয়েছে কথ্যভাষা 'সাদ্‌রি'র।

Cultural Research Institute (CRI)-র Bulletin থেকে দেখা যায় যে, ওরাওঁ, মুন্ডা, সাঁওতালী প্রভৃতি আদিবাসী শ্রমিকরা নিজেদের মধ্যে যথাক্রমে ওঁরাও, মুন্ডা ও সাঁওতালি ভাষাতেই কথা বলেন কিন্তু বাইরে অন্যের সাথে 'সাদ্‌রি'ই তাদের কথ্যভাষা। তেমনই খড়িয়া, বরাইক, গোন্ড প্রভৃতি গোষ্ঠীর মানুষও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'সাদ্‌রি'-ই ব্যবহার করেন। গানের ক্ষেত্রেও আদিবাসী ও অন্যান্য সকলের সুর প্রধানত 'ঝুমুর' যে সুরে রয়েছে কোমল 'গান্ধার' ও কোমল 'নিষাদে'র বিশেষ প্রয়োগ এবং গানে কথার উচ্চারণ পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, সাঁওতাল পরগনা অঞ্চলের ঝুমুরের উচ্চারণ। গানে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিও ঝুমুর গানের উপযোগী ঢোল, ধামসা, মাদল, বাঁশি প্রভৃতি। এদের জীবনে উৎসবের ক্ষেত্রেও ঝুমুর অঞ্চলের উৎসবের প্রাধান্য। জিতিয়া, করম, মাই, ফাগুয়া, দশেরা, ধর্মেশ, বাঁধনা প্রভৃতি এদের উৎসব জীবনকে ঘিরে রেখেছে।

আবার ফিরে যাওয়া যাক বিষয়বস্তুতে, যেখানে পাই আমরা শ্রমিকদের জীবনদর্শনের বিভিন্ন নিদর্শন।

বড় আশা নিয়ে তারা আসামের চা-বাগান তাদের স্বপ্নের দেশে এসেছে কিন্তু সে স্বপ্ন ভাঙতে সময় লাগেনি। তখন চা শ্রমিকদের জীবন কেমন ছিল? এ সম্পর্কে প্রখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ্ দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের উদ্ধৃতি উল্লেখযোগ্য :

'Tea cultivation in Assam is a grand industry and it has largely contributed to the material prosperity of the produce...If, in securing these advantages in immigrant labourers were subjected to such hardships as were not beyond human endurance, we would probably not have raised our voice...'

তাই তাদের গানে আমরা পাই—

'কোর মায়া যেমন তেমন
পাতা তুলা টান গ
হায় যদুরাম, ফাঁকি দিয়া পঠাইলি আসাম
হায় যদুরাম, ফাঁকি দিয়া চলাইলি আসাম
হে নিঠুর শ্যাম, ফাঁকি দিয়া পঠাইলি আসাম।

আসামের চা-শ্রমিক জীবনকে এতই সুন্দর স্বপ্নময় করে তাদের সামনে তুলে ধরা হত যে বাস্তবে তার বিপরীত রূপ দেখার পর তাদের মধ্যে যে মনস্তাত্ত্বিক বিপ্লব ঘটত তারই অভিব্যক্তি দেখতে পাই আমরা এখানকার বিভিন্ন গানে। 'ফাঁকি দিয়া পঠাইলি আসাম'-এর বহুল বিবিধ ব্যবহারে।

'মনে করি (ছিল) আসাম যাব
জড়া পাঙ্খা টাঙাইব
সাহেব দিল কোদালির কাম
হে নিঠুর শ্যাম, ফাঁকি মারি আনিল আসাম।

ফাঁকিজুকি মারি মোরে শ্যাম পাঠাইলেন ডিপু ঘর
পাকা খাতায় লিখা আছে নাম
সাত পুরুষের নাম
হে নিঠুর শ্যাম, ফাঁকি দিয়া পঠাইলি আসাম।'

'ডিপু' ঘর ব্যবহৃত হত শ্রমিক ধরার কেন্দ্র হিসেবে। শ্রমিকদের জোর করে ধরে এনে ডিপু ঘরে রাখা হত এবং পরে রেলগাড়িতে চা-বাগানে পাঠানো হত। অনেক সময়ে এই ডিপু ঘর ব্যবহৃত হত নারীনিগ্রহের কেন্দ্র হিসেবেও।

গানে আমরা পাই—

'পাতা তুলা যেমন তেমন
কর মায়া চুলাচুলী
কলস করা বড় কঠি কাম
হে নিঠুর শ্যাম, ফাঁকি দিয়া পঠাইলি আসাম।'

শ্রমিকদের কঠিন জীবনের আরও নিদর্শন পাই, এই গানে—

'সর্দার বলে কাম কাম
বাবু বলে ধরি আন
সাহেব বলে লিব পিঠের চাম
হায় নিঠুর শ্যাম, ফাঁকি দিয়া পাঠাইলি আসাম।'

মহিলা শ্রমিকদের জীবন ছিল আরও কঠিন। সন্তান প্রসবের পরের দিনই সন্তানকে পিঠে বেঁধে পাতা তোলার কাজে যেতে হত। তাই গানে পাই—

'পিঠামে বাল ছোয়া
মুরমে টুকরি হায়রে
রদে বরক্ষণে ভায়া, পাতাকে তুরালি।'

অথবা

'রাঁচি সে ভেজল কুলি
দেহ দেখাই কলম ছুরি
ডালে ডালে বাবু নজর মিশাইছে
ডালে ডালে বাবু নজর বৈঠাইছে।'

কাজের উপর কড়া নজর যাতে কেউ ফাঁকি দিতে না পারে। কিন্তু মেয়ে কুলিদের ক্ষেত্রে সেই নজর যেন আরও অন্য কিছু। এসব গানে আরও লক্ষনীয় শ্যাম, নিঠুর শ্যাম, নধর শ্যাম প্রভৃতি অভিব্যক্তির বহুল ব্যবহার। এখানেও পাই ঝুমুরের 'রাধাকৃষ্ণ' অভিব্যক্তির প্রভাব। মানভূম অঞ্চলের দরবারি ঝুমুরে বৈষ্ণব পদাবলি অনুসরণের রাধাকৃষ্ণলীলার প্রভাব অত সুবিদিত। সেই প্রভাব থেকে বোধহয় মুক্ত হতে পারেনি চা-বগান অঞ্চলের ঝুমুর গানও।

শ্রমিকদের স্বপ্নভঙ্গের গানে আরও দেখতে পাই—

'যার হতে লাঠি ঠেঙা
তার হাতে ছল বারি
কলং-এ গিরিছে কারাগাড়ি
ঐ রাইত্ বড়ো দিগ্দারি।'

যার হাতে লাঠি, তার হাতে ক্ষমতা—তার নির্দেশে কাজ করা ছাড়া কোনও উপায় নেই। কলং—আসামের একটি নদী। সেই নদীর কাদায়-জলে মোষের গাড়ি আটকে গেছে; সুতরাং আজ রাতে এই শ্রমিকের কপালে অনেক দুঃখ আছে।

CRI-এর প্রতিবেদন থেকে পাওয়া যায় চা-শ্রমিকদের সমাজজীবন সম্পর্কে কিছু ধারণা।

'In majority of cases, marriage is generally settled by negotiation although marriage by force, love and elopement are not uncommon among these people. Divorce is common and divorced and widowed persons can marry....the incidence of pre-marital and extra-martial sex-relations are high.'

সর্ব দেশের সাহিত্যে সংগীতে প্রেমের প্রাধান্য। প্রেম ও প্রকৃতি সব লোকসংগীতের মতো চা-বাগিচার সংগীতেও প্রাধান্য লাভ করেছে। বিশেষ করে যে সমাজে সামাজিক বন্ধন শিথিল, জীবিকার তাগিদেই স্ত্রী-পুরুষের মেলামেশার সুযোগ অবাধ, প্রাকৃতিক পরিবেশ যেখানে প্রেমের পক্ষে বিশেষ অনুকূল, সেই সমাজজীনে প্রেম যে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে তা বলাই বাহুল্য। চা-বাগিচার গানের মধ্যে তাই আমরা খুঁজে পাই অসংখ্য প্রেমের গান। যেমন—

'গিরগিটি বিষম জ্বালা
আর গাথিব প্রেমের মালা গ
তোর সঙে বানাব প্রেমের ডোলনা
আর সখি যাতে দিব না,
আনিব সাগরের লতা
বনাইবি প্রেমের সুতা গ
তোর গলায় প্রেমের সুতা দিব না
আর সখি যাতে দিব না
বৃন্দাবনে রাস লীলা
গোপীন্ সবে করে খেলা গ
তোর গলায় ফুলের মালা দিব না
আর সখি যাতে দিব না।'

এখানে গিরগিটিকে প্রেমের রূপক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

'যখন ফুল কলি ছিল
তখন ভাওড়া আইল গেল

আবে ভাওড়া কোন্ ফুলে মজিল
পুরানো পীরিতি ছাড়ি নোতুনে মজিল।'
কলি ফুটি ফুল হইল বাস সব উড়ি গেইল
আবে ভাওড়া নোতুন কলি পাইল
পুরানো পীরিতির কথা ভাবিতে ছাড়িল।'

সেই চিরন্তন কথা। প্রেমিককে ভোমরা কল্পনা করে তার এ ফুল থেকে সে ফুলে মধু আহরণের চিরন্তন অভিযোগ।

প্রেমিক-প্রেমিকার সহজ সরল প্রেম অভিব্যক্তির প্রকাশ পাই আরও কিছু গানে।

'রিমি ঝিমি পানিয়া বরইস্ গেলাই না
এই সান্ সুন্দর খপা হামার ভিজ গেলাই না
ছাতা ধরো হে দ্যাওরা, এই সান্ সুন্দর শাড়ী হামার ভিজ গেলাই না।
গাছা মধ্যে দেখলি পিপইর গাছা না
(এ রাম) বিনা বাতাসে পিপইর পাত লড়ে না
ছাতা ধরো হে.....।।
ঘড়া মধ্যে দেখলি টাঙ্গিল ঘড়া না
(এ রাম) বিনা চাবুকে ঘড়া দৌড় মারে না
ছাতা ধরো হে.....।।

পিপইর অর্থাৎ বটগাছ, ঘড়া→ঘোড়া।।

তেমনই আর একটা সুন্দর গান দেখতে পাই সামাজিক জীবনদর্শন নিয়ে—

'বনমে সো ভেলা বনকে হরনি হায়রে
শিকারী তো মারি লেলাই বন শোভা ভেল্।
জলমে সো ভেলা জলকে মছরি হায়রে
জালুয়া তো মারি লেলাই জল শোভা ভোল্।
ঘুর মে সো ভেলা ঘরকে বারহল্ বোটি
কুটুমেতে লেয়ী গেলাই ঘর শোভা ভেল্—
হায়রে হায়রে হায়—
কুটুমেতে লেয়ী গেলাই ঘর শোভা ভেল্।'

সামাজিক জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্র যেমন—মদ্যপান, সন্তান-সন্ততির শিক্ষা, শ্রমিক জীবনের পরিণতি, পারস্পরিক সম্পর্ক, সামাজিক রীতিনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে চা-শ্রমিকদের দৃষ্টিভঙ্গির কিছু পরিচয় আমরা পাই CRI-র প্রতিবেদন থেকে। ওই একই দৃষ্টিভঙ্গির অভিব্যক্তি লক্ষ করা যায় ওই অঞ্চলের কিছু গান থেকেও।

চা-শ্রমিক, কুলিজীবনের বাঁধন থেকে তাদের কোনও রেহাই নেই এই তাদের ধারণা। ওদের গানে পাই—

'সাধের বোটি চাঁপার কলি
কত রত্নের ধন

সড়কে উঠিয়ে কুলির উলসিত মন
কুলি চলিল রে—চলিল জনমের মতন।
রাহের সিজা ডিংলা কাটা যাবিনা রে মন
কুলি চলিল রে, চলিল জনমের মতন।'

অধিকাংশই শ্রমকই নেশাভাঙে অভ্যস্ত। মদ, গাঁজা, বিড়ি, সিগারেট তাদের জীবনের অঙ্গ, যদিও তারা বুঝতে পারে যে, এই নেশা তাদেরকে নিয়ে যায় সর্বনাশের দিকে।

ব্রিটিশ চা কোম্পানি যেমন শুরুতে বিনা পয়সায় চা বিতরণ করে চায়ের নেশা ধরিয়েছে, একইভাবে সাহেবরা মজদুরদের মধ্যে বিনামূল্যে 'লাউপানি' বিতরণ করে তাদের বশে রেখেছেন এবং নেশা ধরিয়ে তাদের অর্থনৈতিক সর্বনাশের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছেন। এদের গানে দেখতে পাই—

'ব্রিটিশদের রাজ্য ছিল,
মদ খাতে শিক্ষা দিল
হায়রে হায়, ভারত গরীব হইল।'

আর একটি গানে পাই—

'লাহুকে পানি খাইকে
পয়সা কমাইলি হায়রে
ওহি পয়সায় বাঙেলা বনাইলি
মজদুর রহল ভাঙা ঘরে।'

কোম্পানির মালিক, কোম্পানির বাবুদের বিরুদ্ধে এদের অনেক অভিযোগ। এরা অনুভব করতে শিখছে যে তাদের পরিশ্রমের ফল লাভ করছে কোম্পানির মালিক ও বাবুশ্রেণির কর্মচারীরা। তাই তাদের গানে পাই—

'একতলা দুইতলা বাঙেলা বনাইলি হায়রে
দিনে রাতে বিজুলিকের বাতি
গরম লাগলে পঙ্খাকে চলালি
ঠান্ডা লাগলে চুল্হাকে জ্বালালি
মজদুর, বুঢ়া সময় ঘর খালি ভেল্।'

জীবনধারণের সব সুযোগসুবিধাই মালিক ও উঁচু কর্মচারীরা পেয়ে যায় কিন্তু যে শ্রমিকের পরিশ্রমের ফলে এ সব সম্ভব হয়েছে তারা সুযোগসুবিধা থেকে রয়ে যায় বঞ্চিত।

CRI-র ১৯৬৪ সালের প্রতিবেদন থেকে পাওয়া যায় যে চা-শ্রমিকদের মধ্যে ৮৪% নিরক্ষর, ৭% নাম লিখতে জানে এবং বাকিরা প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষালাভ করেছে। সন্তান-সন্ততির শিক্ষা সম্পর্কে তারা, বিশেষ করে আদিবাসী শ্রমিকরা, প্রায় উদাসীন। তবে এ অবস্থার পরিবর্তন শুরু হয়েছে। শিক্ষার সুফল তারা বুঝতে শুরু করেছে। ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে তাদের মনোভাবের পরিচয় আমরা গানেও পাই।

'বাবু ভায়ার ছানাপোনা
ইস্কুলে পড়ে যায়রে
হামার ছানা পকা বিছে খায়
এহে সখি জীয়ে কের উপায়।'

পকা—এক বিশেষ ধরনের পোকা যা চা-পাতার ক্ষতি করে। শ্রমিকের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ার জন্য স্কুলে না গিয়ে শিশুশ্রমিকে পরিণত হয়।

এভাবে শ্রমিকদের মধ্যে প্রচলিত গানগুলির বিশ্লেষণ করলে তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক জীবনের নানা দিকের প্রতিফলন আমরা দেখতে পাব এইসব গানের মধ্যে।

বিহারের ছোটনাগপুর ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে কিছুটা সুন্দর সুস্থ জীবনের প্রলোভনে এবং কিছুটা বাধ্য হয়ে জীবিকার তাগিদে এই শ্রমিকরা এসেছে প্রাকৃতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সব দিক থেকেই সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে, নতুন পরিস্থিতিতে। এখানে এসে কিন্তু তারা নিজেকে হারিয়ে ফেলেনি। নতুন পরিবেশে সকলেই নিজেদের সত্তা জিইয়ে রেখে প্রয়োজনের তাগিদেই 'সাদরি'-র মতো এক সমন্বয়ধর্মী ভাষা ও অনুরূপ সংস্কৃতি সৃষ্টি করেছে এবং সেই সংস্কৃতির ছায়ায় নিজেদের সুখ-দুঃখ নিয়ে এগিয়ে চলেছে। পুরোপুরি সুখী হয়তো তারা নয়। কিন্তু এ কথা সত্য যে তাদের আত্মীয়স্বজন যারা এখনও তাদের দেশে (ছোটনাগপুর ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে) রয়েছে, তাদের চেয়ে খুব অসুবিধের মধ্যে তারা নেই। চা-বাগানের সেই পুরনো অবস্থা আর নেই। চা-শ্রমিকরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ইতিমধ্যেই অনেক সুযোগসুবিধা আদায় করে নিয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক অবস্থা সব দিক থেকেই তারা অনেকটাই এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছে। সেই সুযোগের সদ্ব্যবহারের দৃষ্টিভঙ্গিও তারা ধীরে ধীরে লাভ করছে।

এমনকি সংগঠনের কার্যকলাপের গঠনমূল সমালোচনা তারা করতে শিখেছে। এ ধরনের একটি গানে পাই—

'শুন তাই সভাজন, করি আমি নিবেদন
কহি আমি সংঘ বিবরণ
এস ভাজন.....।।
প্রথম সংঘের কালে কত কথা বলেইছিলে
মজদুরের দুখ যাবে দূর
এস ভাজন.....।।
বলাছ টাকা বহুত পাবে পাকা ঘরে বাতি হবে
তাদের বেতন বাড়িবে অনেক
এস ভাজন.....।।
'তাদের ছেলে বাবু হবে
বাগানের কাম চালাবে

তাদের নাম বাড়িবে অনেক
এস ভাজন.....।।
খাইবার টান হইল
ছেনাপোনা মুখে ভরল
চাউল হইল পাঁচ টাকা কিলো
এসভাজন.....।।
ঘর মেরামতি না হইল
ঘরে থাকিতে হইল কঠিন
এসভাজন.....।।
বালি রাইজের চরণ ধইরে
সংঘের মেম্বার নাই হইলে
তার বিপদ ঘটিবে অনেক
এসভাজন.....।।

এ সবই তারা শিখেছে বাঁচার তাগিদে—এগিয়ে চলার তাগিদে। সঙ্ঘবদ্ধ সংগ্রামী চেতনা যাতে সত্যি সত্যিই তাদের জীবনকে সুস্থ, সুন্দর করতে পারে সেই অনুভূতি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা আজ তাদের মধ্যে প্রতীয়মান।

---

*[এই প্রবন্ধ লেখার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট লোকসংগীতশিল্পী ও গবেষক শ্রীকালী দাশগুপ্ত মহাশয় আমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন। বিশেষ করে গানগুলি সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে শ্রীদাশগুপ্তের কাছে আমি ঋণী।]*

* সৌজন্যে : লোকশ্রুতি, মার্চ—১৯৯২।